উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ঃ দরিদ্র ছেলেদেরও সম্পৃক্ত করা হোক

মকবুলা পরভীন

নির্বাচন পূর্বকালে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জোট সরকার মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছে। এতে মেয়ে শিক্ষার এক যুগান্তকারী সফলতা অর্জিত হবে আশা করা যাচ্ছে। মেয়েরা একসময় শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। যুগের পরিবর্তন হয়েছে। স্কুল-কলেজ কাছে থাকলে নিম্নবিত্ত পরিবারের মা-বাবাও মেয়েদের শিক্ষালাভে আর অন্তরায় হতে চান না। ভালো ছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারিদ্র্য আর প্রধান বাধা হয়ে থাকছে না। সরকার মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তাদের প্রাইমারী-হাই স্কুলের লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছিল। এখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হলো।

ঠিক এ মুহূর্তে অনেক দরিদ্র অভিভাবক এবং তাদের জ্ঞানপিপাসু ছেলেরা মানসিক গ্লানিতে ভুগছে যে, তারা বা তাদের সন্তানরা দরিদ্র অথচ ছেলে হয়ে জন্মাবার কারণে সরকারী সুযোগের আওতায় পড়ছে না। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রুদ্ধ। বর্তমান যুগে একজন ছোট চাকরিজীবীর জন্যও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিত হওয়া জরুরী হয়ে উঠেছে। সে পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে বাংলাদেশের অনেক ছেলে নিম্নমানের পেশায় জীবন পয়মাল করছে। স্বল্প পারিশ্রমিকে কঠিন শ্রমে জীবন দিচ্ছে। কেউ হয়ে পড়ছে বেকার। অর্থের অভাবে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে অনেক প্রতিভাই টানছে রিকশার ঘানি, পরের জমিতে কামলা খাটছে বা বিপথে যাচ্ছে। এর খোঁজ কি কেউ রাখে?

ইতোমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় ছেলেদের আকুল আবেদন সম্বলিত লেখালেখি শুরু হয়েছে। এটা বাস্তব যে, একটি পরিবারের বোনটি সরকারী খরচে শিক্ষিত হতে পারছে অথচ ভাইটি অশিক্ষিত মূর্খ হয়ে বোনের সৌভাগ্যের দিকে তাকিয়ে সরকারের নাগরিক বৈষম্যের কথা ভাবছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এ বেদনা বোনের এবং পরিবারের অভিভাবকের জন্যও মানসিক নির্যাতনের চেয়ে কম নয়। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা দরিদ্র ও নিরক্ষর তাদের পরিবারে ছেলে সন্তান হচ্ছে 'আশার' নাম। ছেলে বড় হয়ে পরিবারে দায়িত্ব গ্রহণ করবে এমন কিছু আশা দরিদ্র পরিবারগুলো করে থাকে। ছেলেরা শিক্ষার সুযোগ পেলো না অথচ পরিবারের সব মেয়ে শিক্ষিত হলো- এতেও কিন্তু সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। কারণ, শিক্ষিত নারী কখনো অশিক্ষিত পুরুষকে বিয়ের ক্ষেত্রে পছন্দ করবে না। এ ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর পরিবারের মধ্যে বিবাহ সমস্যা সৃষ্টি হবে আবার শিক্ষিত চাকরিজীবী নারী ও বেকার বা শ্রমিক পুরুষের বিয়েও সম্ভব হবে না। বিয়ে হলেও তা টেকা মুশকিল। নারী-পুরুষ সমপর্যায়ের শিক্ষিত ও মনমানসিকতাসম্পন্ন না হলে বৈবাহিক সূত্র টেকে না- এটা সমাজবিজ্ঞানীরাই বলে থাকেন। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ১৯৪৭ পূর্বকালে মুসলমান ছেলেদের চেয়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে পাসের সুযোগ দেয়া হতো বেশী। এটা ছিল তৎকালীন ভারতের একটি শ্রেণীর তীব্র মুসলিম বিদ্বেষের ফল। তারা চিন্তা করতো, এতে মুসলমান ছেলেদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম হবে এবং মেয়ে শিক্ষার হার বেড়ে যাবে। ফলে, সামাজিকভাবে এই শ্রেণীটির ভারসাম্য নষ্ট হবে। মুসলমান বেকার যুবক ও আইবুড়ো শিক্ষিতার হার বেড়ে যাবে। বিয়ের ক্ষেত্রে তখনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিষ্ঠা যাতে বেশী থাকে। এর ভারসাম্য নষ্ট হলে মুসলমান মেয়েদের আন্তঃবিবাহ বেড়ে যাবে, তারা আত্মমর্যাদা হারাবে। এ ধরনের ষড়যন্ত্র কার্যকর করা ছিল একশ্রেণীর বোদ্ধার মিশন। আজ সে দিন নেই। বর্তমানে মেয়ে শিক্ষার প্রসারতার চিন্তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। পশ্চাৎপদ নারী সমাজকে সামনে এগিয়ে দেবার সব পরিকল্পনাকেই আমাদের শুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করতে হবে। কারণ, শিক্ষিত মা-ই পারে জাতিকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করতে। আজকের ছাত্রীই আগামী দিনের মা। কাজেই ঘুমিয়ে থাকা মা বা মাতৃত্বকে যারা ধারণ করছে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের পদচারণাকে দৃপ্ত করতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাকে আমরা অকুণ্ঠভাবে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করতে চাই।

পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রদের পড়ালেখা করার অসীম ইচ্ছার অপমৃত্যু যাতে না ঘটে সরকারের কাছে সেদিকটি বিবেচনা করার দাবীও আমরা জানাচ্ছি। যারা গরীব বা যাদের পিতা-মাতা অভাবের জন্য ছেলেদের শিক্ষিত করতে পারছেন না- তাদেরও অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত করা হোক। মেয়েদের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এ সুযোগটি দেয়া হলে তারা অবশ্যই উপকৃত হবে। সমাজের একটি দিক আলোকিত করে অন্য দিকটি অন্ধকার রাখা ঠিক নয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন সুযোগ বিকশিত করা হয়েছে তেমনি সব ছেলেদের জন্য সুযোগের দাবী কেউ করছে না। করছে সেইসব ছেলে বা তাদের অভিভাবক, যারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে উঠে আসবে। হয়তো তাদের মাঝেও আছে ভবিষ্যৎ কৌসুলি, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, নেতা, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী। সরকারের বহু অর্থ নিষ্ফল প্রকল্পে ব্যয় হয়। শিক্ষা প্রকল্পে সরকার বিনিয়োগ বাড়ান। সুফল হাতে পেতে হয়তো দেরী হবে না।

JAN 17 2002